কার্তিক পূর্ণিমা
কর আশা খনা
ডেকে বলে
শুনবে চাষা
নির্মল মেঘে
যদি বাত হয়
রবি শস্যের ভার
ধরণী না সয়

চাষের কথা

কার্তিকের
উনো জলে
দুনা ধান
খনা বলে

বর্ষ ১৩ ।। সংখ্যা ৫ ।। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১০ ।। ১৫ ভাদ্র-১৩ কার্তিক ১৪১৭

সাশ্রয়ী ধান ঝাড়াই

আসামের মহম্মদ ফজলুল হক এক ধান ঝাড়াই মেশিন বানিয়েছেন। এই মেশিনে ধান ঝাড়লে, ঝাড়ার পর খড় আস্ত পাওয়া যায়। এমনিতে মেশিন বা হাতে ঝাড়লে ধান আলাদা হয় কিন্তু পাওয়া খড় গোটা থাকে না, টুকরো হয়ে যায়। কিন্তু এই মেশিন তা করে না। এই মেশিন আস্ত খড় ফেরত দেয়। কুচো খড় গরু খায় না, কুচো খড়ে পুষ্টিগুণও কম। কুচো খড় চাষি বেচতেও পারে না। ফলে লোকসান। মেশিনের জন্য দরকার কেবল ৫ অশ্বশক্তির ইঞ্জিন। যা কিনা ট্রাকটরের ইঞ্জিনে লাগিয়েও চালানো যায়। ঘণ্টায় গড়ে মেশিন ৩০০ কেজির মতো ধান ভানতে পারে। মাশুরি ধানের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ৯০০ কেজি। এই মেশিন তৈরি ফজলুল শুরু করেন ২০০৩-এ।

নানা আকার পেতে পেতে ২০০৫-এ মেশিনটি আজকের রূপ পায়। আসামের কৃষিবিভাগ বলছে, এই অঞ্চলে দেশীয় কারিগরিতে তৈরি এই ধরনের এটিই প্রথম মেশিন। আজ অব্দি ফজলুল রাজ্যের নানা জায়গায় ৭৫টার বেশি মেশিন বিক্রি করেছেন। মেশিনের সব মিলিয়ে দাম ৩৫ হাজার। এর মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার গাড়ি খরচও আছে। সম্প্রতি মেশিনটি রাষ্ট্রপতি ভবনে লোকায়ত উদ্ভাবনা প্রদর্শনীতে দেখানোও হয়েছে। ■■

হিন্দু ১২ মে ২০১০

যোগাযোগ :
মহম্মদ ফজলুল হক
গ্রাম মৌরিবাড়ি, জেলা মরিগাঁও, আসাম।
দূরভাষ : ৭৮২১২৬, ৯৮৬৪৮৬৭০১২

অন্য পাতায়
গ্রামোন্নয়ন ও রবীন্দ্রনাথ : ৩
কেঁচোসারের বিপুল ব্যবসা : ৭
লাউশাক : ৬

খাদ্য, গণবন্টন, রোগভোগ

- গ্রামে অর্ধেক পরিবারেরই পাকাবাড়ি ও বিদ্যুৎ সংযোগ নেই।
- জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা অনুসারে ১৫-৪৯ বছর বয়সী মহিলাদের প্রায় ৫৫.৩ শতাংশ রক্তাল্পতায় ভুগছে।
- বিশ্বের যক্ষ্মা রোগীর ২১ শতাংশের বাস ভারতে। ডায়াবেটিক রোগীর সংখ্যা ৫ কোটির বেশি। ভারতের ১১৫ কোটি জনসংখ্যার ৮০% হল ৯২ কোটি। একটি পরিবারে গড়ে যদি ৪.৮ জন থাকেন তাহলে মোট পরিবার (৮০% মধ্যে) ১৯.১৭ কোটির জন্য গণবন্টন ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এতে UPDS-এর জন্য খাদ্যশস্যের পরিমাণ দাঁড়াবে ৮০৫.১ লক্ষ টন। অর্থাৎ ৮০% পরিবার পিছু ৩৫ কেজি খাদ্যশস্য বিপিএল দামে দিতে গেলে কেন্দ্রের অতিরিক্ত ব্যয় দাঁড়াবে ৪২,২৩৭.৯ কোটি। যা ভারতের মোট উৎপাদনের (জিডিপি-র) ০.৬৪%। বর্তমানে সরকারি (২০১০-২০১১ আর্থিক বছরে) ভরতুকির জন্য ধরা আছে ৫৫,৫৭৮ কোটি টাকা। এ দুটি মেলালে মোট ভরতুকি দাঁড়ায় ৯৭৮১৫.৯ কোটি টাকা যা জিডিপির ১.৪৮%। এটা এমন কিছু বেশি খরচ নয়। কারণ ২০১০ ১১ আর্থিক বছরে সরকার কর, রাজস্ব এবং অন্যান্য ছাড় দিয়েছে (মূলত ধনী, শিল্পপতি ও করদাতাদের) ৫০২, ২৯৯ কোটি টাকা যা জিডিপির ৮০%।

উৎস :
টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোসাল সায়েন্সেস প্রতিবেদন ০৯.০৯.২০১০

ক্ষুধার সূচক অনুযায়ী ভারত, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান থেকে পেছিয়ে।

এই সূচক তৈরি করে সমীক্ষা করে আইএফপিআরআই বা ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট। মাপকাঠিগুলি হল ১। শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির ব্যাপকতা ২। শিশু মৃত্যুর হার ৩। ক্যালরি ঘাটতি রয়েছে এমন মানুষের অনুপাত। এই সূচকগুলিকে মিলিতভাবে ১০০ নম্বর দেওয়া হয়। এর মধ্যে যাদের সংখ্যা ০-র দিকে তাদের ক্ষুধার্ত মানুষ কম। আর যাদের বেশির দিকে তাদের ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বেশি।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই সূচকের মাধ্যমে উদ্বেগজনক ও চরম উদ্বেগজনক দেশ ভাগ করা হয়েছে। চরম উদ্বেগজনক দেশের মধ্যে রয়েছে কঙ্গো, বুরুন্ডি, ইরিডিয়া, চাদ। উদ্বেগজনক পরিস্থিতি রয়েছে হাইতি,ইয়েমেন, নেপাল, তানজানিয়া,কম্বোডিয়া, সুদান, জাম্বিয়া, বুরকিনা ফাসো, টোগো, গিনি-বিসাউ, রুয়ান্ডা, জিবুতি, মোজাম্বিক, ভারত, বাংলাদেশ, লাইবেরিয়া, তিমুর-নেসাথি, নাইজার, অ্যাঙ্গোলা, মাদাগাস্কার, সিয়েরা লিওন, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক ও ইথিওপিয়া।

এই সমীক্ষা ২০১০ বিশ্ব ক্ষুধার সূচক হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। মোট ৮৪টি দেশে সমীক্ষা করা হয়েছে। এই সমীক্ষায় আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির স্থান চিন-৯, পাকিস্তান -৫২, শ্রীলঙ্কা-৩৯, নেপাল - ৫৬। এছাড়া ভিয়েতনাম -২৯, লাওস-৫১, মঙ্গোলিয়া - ৩৩, থাইল্যান্ড - ২২, ইন্দোনেশিয়া-৩৬, কম্বোডিয়া-৫৮, মায়নমার-৫০। ভারতের ঠিক ওপরে আছে মোজাম্বিক আর ঠিক নীচে বাংলাদেশ।

এই খারাপ অবস্থার কারণ হিসেবে অপুষ্টির জন্য কম ওজনের বাচ্চার সংখ্যা ও মহিলাদের সামাজিক অবস্থানের কথা বলা হয়েছে।। রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে যে পৃথিবীর মোট অপুষ্ট শিশুর ৪২ শতাংশের ভারতে বাস।

■■

এক নজরে চাষ ও বসবাসের ভূমিদান প্রকল্প

রাজ্যে প্রায় ১০ লক্ষ ৬০ হাজার ভূমিহীন ও বাস্তুহীন আছেন। এঁদের এক শতকও চাষের জমি নেই, বাস্তুজমিও নেই, অপরের জমিতে বাস করেন। এঁরা মূলত খেতমজুর বা গ্রামীণ কারিগর।

এঁদের একটা স্থায়ী ঠিকানা দেবার উদ্দেশ্যে এসেছে **চাষ ও বসবাসের ভূমিদান প্রকল্প।** এই প্রকল্প গ্রামাঞ্চলের সম্পূর্ণ ভূমিহীন মানুষের জন্য। এই পরিবারগুলি গ্রামে গরিবদের মধ্যে সবচেয়ে নিচে। তাঁরা বাড়ি করবেন, ছোটখাট ব্যাবসা করবেন, অল্পস্বল্প চাষ করবেন এই জমিতে।

বিক্ষিপ্তভাবে জমি না দিয়ে বেশ কয়েকজনকে একসঙ্গে জমি দেওয়ার কথা ভাবা হবে। সেই জমির মধ্যে থেকেই সংযোগকারী রাস্তা বার করা হবে। জমির পাট্টা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মহিলাদের নামে অথবা মহিলা-পুরুষ যৌথ নামে দেওয়া হবে।

কাদের জন্য

১। গ্রামে যাঁদের চাষের জমি নেই
২। যাঁরা বর্গাদার
৩। যাঁরা বাস্তুহীন, অন্য লোকের জমিতে আছেন
৪। শহরে যাঁরা খাসজমিতে বসে আছেন

কে ভূমিহীন আর কে বাস্তুহীন

- ভূমিসংস্কার কর্মসূচিতে ভূমিহীন মানে হল যার ১ একর পর্যন্ত জমি আছে।
- বাস্তু অধিগ্রহণ কর্মসূচিতে বাস্তুহীন মানে হল ১৯৭৫ সালের আগে যে সাবালক ব্যক্তি অন্যের জমিতে বাড়ি করে বসে আছে, কিন্তু জায়গার উপর আইনি অধিকার তার নেই।
- চাষ ও বসবাসের কর্মসূচিতে ভূমিহীন আর বাস্তুহীন মানে হল যার এক শতকও চাষের জমি ও বাস্তুজমি নেই।

কীভাবে দেওয়া হবে

- মহিলাচালিত পরিবারগুলো অগ্রাধিকার পাবে।
- শুধুমাত্র কন্যাসন্তান আছে এমন পরিবারগুলি অগ্রাধিকার পাবে।
- পাট্টা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মহিলাদের নামে বা মহিলা -পুরুষের যুগ্ম নামে হতে পারে।

প্রকল্পের সর্বনিম্ন জমির পরিমাণ ১০ শতক, সর্বোচ্চ জমির পরিমাণ ১৬ শতক। ভূমি ও ভূমিসংস্কার দফতরের আদেশনামা অনুসারে ব্লকস্তরে ৬ সদস্যের এক কমিটির ওপর এই প্রকল্পের ভার দেওয়া হয়েছে।

ইন্দিরা আবাস যোজনার যাঁরা এক্তিয়ারভুক্ত তাঁরাও এই প্রকল্পের সুযোগ পাবেন।

খালপাড় বা অন্য দফতরের জমিতে যেসব ভূমিহীনের বাস তাঁরাও এই প্রকল্পের আওতায়।

প্রতিটি ব্লকে এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য নির্দিষ্ট কমিটি বেনিফিশিয়ারি তালিকা ও জমি বিতরণের দায়িত্বে থাকবে। ■■

ভুল হয়েছে

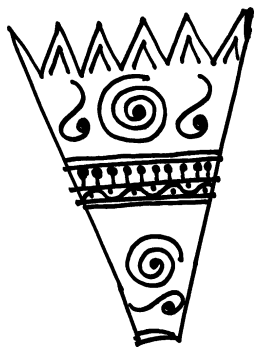

গত জুলাই-আগস্ট ২০১০ সংখ্যায় 'জানেন কি' বিভাগে, গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স-এর বছর '২০০৪'- এর বদলে '২০০৮'হবে। এই জন্য আমরা দুঃখিত।

আ মা দে র ব ই	
বিষের চক্র থেকে প্রকৃতির পথে	২৫.০০
বাংলার শাক	১৫.০০
মাশরুম চাষ : উৎপাদন প্রযুক্তি ও ঔষধিগুণ	৫০.০০
দিন দুনিয়ার গল্প পোস্টার সেট	৫০.০০
মালার গল্প	১০.০০
সুস্থায়ী কৃষি সংক্রান্ত লিফলেট সেট	৮১.০০
ঘরোয়া বাগানের সবজি	৭৫.০০
নকশী কাঁথার মাঠের গল্প	৫০.০০
নার্সারি	২০.০০
সুস্থ থাকুন সহজেই	৫.০০
হাতের কাছেই ওষুধ	১৫.০০
পেটের রোগ	১০.০০
ভেষজ কথা (প্রথম খণ্ড)	৭৫.০০

ন তু ন ব ই	
যা যা শেখা জরুরি	৩৫.০০
প্রাক্ প্রাথমিক প্রশিক্ষণ সহায়িকা	৪০.০০

চাষের কথার
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য
সডাক ৩০ টাকা

সম্পাদকীয়

কেমন কৃষি !

চাষ নিয়ে আমরা সবাই ভাবছি। কেন্দ্রীয় সরকার ভাবছে, রাজ্য সরকার ভাবছে, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ভাবছে, অর্থনীতিবিদও ভাবছেন। কৃষি ভালো করা, কৃষকের ভালো করা প্রায় সকলেরই ধ্যানজ্ঞান।

কেন্দ্রীয় সরকার কৃষির জন্য ব্যাঙ্ক গড়েছে, কৃষিবিমা আছে, এমজিএনআরইজিএসকে কৃষিতে ব্যবহারের উদ্‌যোগ হচ্ছে। কৃষক তথা— গ্রাম তথা—কৃষকের উন্নয়নের জন্য সরকারের উপদেশক পরিষদ নানা দিশা দিচ্ছে। রাজ্য সরকার ভূমিহীনের জন্য নানা প্রকল্প এনেছে। ভূমিহীনের জীবনবিমার ব্যবস্থাও হয়েছে। অন্যদিকে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন চাষবাসের উন্নয়নে কাজ করছে, নানা বিকল্পের পথ দেখাচ্ছে।

আবার সরকার কিছু কাজ করেওনি। সরকার জিএম তুলোয় নিষেধ করেনি। সরকার শিল্পের জন্য চাষ জমি দেওয়ায় বাধ সাধেনি। সরকার কৃষক বিপন্নতার বীজ বিলের প্রস্তাবে গররাজি হয়নি। আর আপনার রাজ্যে সরকার কৃষি কমিশনের জৈবচাষের সুপারিশ প্রায় এক বছর পরেও কার্যকারী করেনি।

তাই নানা মহলের এত উদ্যোগ সত্ত্বেও, কৃষি আজও আমাদের কাছে কেমন যেন ফেলনা মনে হয়, গুরুত্বহীন মনে হয়। নিদেনপক্ষে, কৃষি নিয়ে টু জি স্পেকট্রামের মতো একটা বড়সড় কেলেঙ্কারি হলেও তবু কোথাও সান্ত্বনা পেতাম।

হিমেল শুভেচ্ছা

সেপ্টেম্বর ২০১০

গ্রামোন্নয়ন আর গ্রাম পুনর্গঠন : বর্তমানের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ

অশোক সরকার

বর্তমানের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়নের চিন্তা ও সেই সংক্রান্ত পরীক্ষানিরীক্ষাকে দেখতে গেলে প্রথমেই কথা উঠবে যে বর্তমানের দৃষ্টি বলতে কী বোঝায় ? সেটা কি কোনো একটা দৃষ্টি না একাধিক আলাদা দৃষ্টি আছে ? কাজেই আগে সেইটি স্পষ্ট করে নেব।

বর্তমানের গ্রামোন্নয়নের দৃষ্টি মূলত মানব উন্নয়নের কাঠামোকে ঘিরে তৈরি হয়েছে। সর্বজনীন শিক্ষা, সার্বিক স্বাস্থ্য, বিভিন্ন সম্প্রদায়-জাতি-জনজাতির মধ্যে সামাজিক সমতা, নারী-পুরুষ সম্পর্ক (জেন্ডার), নারী উন্নয়ন, শিশু স্বাস্থ্য, খাদ্য সুরক্ষা, রোজগার ইত্যাদি হল এই কাঠামোর অঙ্গ। আজকাল তার সঙ্গে জুড়ে গেছে পরিবেশের কথা, মানবাধিকারের কথা, ব্যক্তি ও সমষ্টি-স্বাধীনতার কথা। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, আর্থিক দারিদ্র কমানোর পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন এখন প্রধান কাম্য। যেহেতু পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মানুষের সিংহভাগ মূলত গ্রামেই আছে, তাই গ্রামোন্নয়ন মানে এখন গ্রামের মানুষদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। এই উন্নয়নের মূল দায়িত্ব কার উপর বর্তায় ? দেখা যাচ্ছে যে এই কাঠামোতে বদলের মূল রূপকার হল একদিকে রাষ্ট্র বা সরকার আর একদিকে বাজার। শিক্ষা-স্বাস্থ্য- সামাজিক সমতা, শিশু স্বাস্থ্য—নারী উন্নয়ন, জেন্ডার, ব্যক্তি বা সমষ্টি-স্বাধীনতা ইত্যাদি মূলত রাষ্ট্র বা সরকারের কাজ আর পরিবেশ, রোজগার, অংশত জেন্ডার, সামাজিক সমতা ইত্যাদি বাজার আর রাষ্ট্র, দুজনেরই কাজ। গ্রামের সব মানুষ শিক্ষা পেল কিনা, সার্বিক স্বাস্থ্যের স্বাদ পেল কিনা, মেয়েদের সমাজে অবস্থান পুরুষদের তুলনায় কিছুটা হলেও বদলাল কিনা, নাগরিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা নাগরিকের আয়ত্তে এল কিনা, এসব দেখবে রাষ্ট্র। আর পরিবেশ দূষণ কমছে কিনা, কর্মস্থলে মেয়েদের অবস্থান ভালো হচ্ছে কিনা, সমাজে সব শ্রেণির মানুষ সমান মর্যাদা পাচ্ছে কিনা, গ্রামের মানুষের রোজগার বাড়ছে কিনা, প্রতিটি গৃহে খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত হচ্ছে কিনা, এসব রাষ্ট্র আর বাজার দুটিকেই দেখতে হবে। সাদা কথায় এই হলো কাঠামো। মানব-উন্নয়নের লক্ষ্যের সঙ্গে রাষ্ট্রিক বা বাজারতান্ত্রিক সমাজের বিশেষ কোনো বিরোধ নেই। কারণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা আর চয়নতত্ত্ব, দুটিতেই রাষ্ট্র আর বাজারেরই মূল ভূমিকা এটা প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

বর্তমানের এই দৃষ্টির পিছনে একটি বিশেষ 'উন্নয়ন দর্শন' কাজ করছে সেটাও স্পষ্ট হওয়া দরকার। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-জেন্ডার-পরিবেশ-মানবাধিকার যাই বলি না কেন, তার সবেরই মূলে একটা অধিকারকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে। তার মানে মানব উন্নয়ন রাষ্ট্র বা বাজারের দয়ায় ঘটবে না। প্রতিটি ব্যক্তির হক থেকে উন্নয়নের এই বিষয়গুলিকে দেখতে হবে। মানে শিক্ষা আমার হক, সার্বিক স্বাস্থ্য আমার হক, খাদ্য সুরক্ষা আমার হক, শিক্ষা-স্বাস্থ্য শিশুর হক,

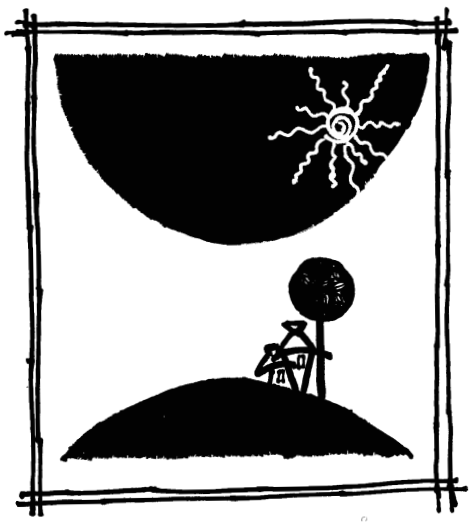

যে জমি চাষ করে জমির মালিকানা তার হক, বনেজঙ্গলে যে মানুষজন বংশপরম্পরায় বাস করছে, সেই বনাঞ্চলের মাটি তাদের হক, এই রকম। সেই হক বা অধিকারের স্বীকৃতি থাকবে। সংবিধান বদলে, নতুন আইন করে, এই সব হকের স্বীকৃতি দেবার চেষ্টা হচ্ছে নিরন্তর। সর্বশেষ যে আইন—খাদ্য সুরক্ষা আইন—যা এখন আলোচনার টেবিলে, সেখান থেকে শুরু করে পিছোতে থাকলে দেখব, শিক্ষার অধিকার আইন, বনবাসীদের অধিকার আইন, পারিবারিক হিংসা নিরোধক আইন, ১০০ দিনের কাজের আইন, প্রতিবন্ধী আইন, তথ্যের অধিকার আইন, উপভোক্তা আইন, বীমা আইন সাম্প্রতিককালের যত আইন হয়েছে, তার পিছনে ওই দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার। প্রতিটি আইনে বলা হয়েছে নাগরিককে এই অধিকার দেওয়া হল, আর রাষ্ট্রকে তার জন্য দায়বদ্ধ করা হল। সর্বজনীন শিক্ষা দিতে, সার্বিক স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করতে, প্রতিটি নাগরিককে খাদ্য সুরক্ষা দিতে, বনাঞ্চলের মানুষের জঙ্গলের মাটি ফিরিয়ে দিতে সরকার আর রাষ্ট্র দায়বদ্ধ থাকবে, কারণ সেগুলি মানুষের হক বা অধিকার।

বর্তমানের এই উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার উন্নয়ন দর্শন যে খুব পুরোনো, তা নয়। এর বয়স মেরেকেটে ২০-২৫ বছর। মূলত অমর্ত্য সেন ও মহবাবুল হকের, উন্নয়ন অর্থনীতি কাজের ধারার ভিত্তিতে এই দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে। এঁরা দেখালেন যে শুধু অর্থনীতির উন্নতির উপর নির্ভর করে থাকলে দেশ এগোবে না, কারণ উন্নত অর্থনীতি মূলত যে সব চিহ্ন দিয়ে মাপা হয়, তার সবগুলি বলবৎ থাকলেও দুটো দেশের মানব উন্নয়নের মান অনেক আলাদা হতে পারে। শ্রীলঙ্কা আর দ.কোরিয়ার উদাহরণ দেওয়া হত একসময়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের মানে কোরিয়া এগিয়ে থাকলেও শ্রীলঙ্কা মানব উন্নয়নের মানে অনেক এগিয়ে। এটা যেমন একটি দিক, অন্য দিক হল রাষ্ট্রের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি কল্যাণময় পিতা আর বশংবদ পুত্রের সম্পর্ক, না অধিকার ও দায়িত্বের আদানপ্রদানের সম্পর্ক? ওয়েলফেয়ার না এনটাইটেলমেন্ট, এই হল প্রশ্ন। এখানে এনটাইটেলমেন্ট বা হক কে প্রাধান্য দেওয়া হল। রাষ্ট্রের কথা দিয়ে শুরু হলেও ক্রমশ বাজারের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যেও সেই হকের কথা উঠে এসেছে।

বর্তমানের উন্নয়নের কাঠামো আর তার জন্য প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শনকে এক সঙ্গে মেলালে, দেশ আর সমাজের একটা ছবি বেরোয়। সে ছবি বলছে দেশটা চলবে রাষ্ট্র এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণে, আইনের শাসনে, আর বাজারের অর্থনীতির নিয়মে। দেশের মানুষ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রও আইনের শাসনে বিশ্বাস করবে, শ্রদ্ধা করবে, মেনে নেবে এবং বাজারের অর্থনীতির শক্তিকে প্রশ্ন করবে না। মানুষের চাহিদা আর আশা পূরণের জন্য গণতান্ত্রিক রীতিনীতি থাকবে, আইন তৈরির পথ থাকবে, আইনরক্ষক বা অন্য কথায় বলা যেতে পারে অধিকার-রক্ষকপ্রতিষ্ঠান থাকবে (কোর্ট-ট্রাইবুনাল-লোক আদালত-আই.আর.ডি.এ-পুলিশ-কনজুমার ফোরাম-মানবাধিকার কমিশন-মহিলা কমিশন ইত্যাদি), তাহলেই চলবে। মানুষের নাগরিক অধিকার আর রাজনৈতিক অধিকার দুটোই যদি আইনের পথে সুনিশ্চিত করা যায় তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই।

এই আপাতসুন্দর ছকের মধ্যে গলদ কোথায়

সে কথা এখন বলব না। তার আগে রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়নের ভাবনা ও পরীক্ষানিরীক্ষার একটা ছবি দেখে নি। গ্রামোন্নয়ন কথাটি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেননি, তিনি বলতেন গ্রাম পুনর্গঠন। পুনর্গঠনের তিনটি কাজের উপর তিনি জোর দিয়েছিলেন ১। গ্রামীণ সমাজের মধ্যে যে চিরাচরিত সমবায়ী মনন আছে তার ভিত্তিতে গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান তৈরি ২। গ্রামীণ সমাজের মধ্যে যে সংস্কারের ও জাতপাতের অন্ধকার আছে, তা দূর করা ৩। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার ভিত তৈরি করা। রবীন্দ্রনাথের গ্রাম-পুনর্গঠনের মধ্যে খুব সরাসরি পরিবেশ ভাবনা কাজ না করলেও, প্রকৃতি ও পরিবেশের অমোঘতার কথা তাঁর সমগ্র কাজের মধ্যে এত জোরালো ছিল যে তা নানাভাবে গ্রাম-পুনর্গঠনের কাজেও এসে পড়েছে।

একটু খোলসা করে বলা দরকার। রবীন্দ্র ভাবনার একটা মূল কথা ছিল যে গ্রামের মধ্যে একটা সমষ্টির শক্তি আছে, তার জন্যই ভারতের গ্রাম ২৫০০ বছর ধরে বর্তমান। গ্রামে জমিদার আছে, প্রজা আছে, কামার আছে, ছুতোর আছে, মাঝিমাল্লা, চোর-ডাকাত সবই আছে, কিন্তু সবাই একটা সমষ্টির নিয়মে বাঁধা আছে। এরা কেউই বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি বা পরিবার নয়, এদের পরিচয় শুধু নামে আর পদবিতে নয়, এদের পরিচয় সেই সমষ্টির একজন হিসেবে। এই শক্তিটি খুবই মূল্যবান। সমষ্টির শক্তিটিতে ব্যবহারিক রূপ দিতে গিয়ে তাঁর সমবায় ভাবনার সৃষ্টি। আবার অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ সমাজের অন্ধকার দিকগুলির প্রতি আদৌ অন্ধ ছিলেন না। তিনি মনে করতেন আধুনিকতার শক্তি এইখানে যে তা সমাজের অনেক অন্ধকার থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। কিন্তু সেই মুক্তি সমষ্টিকে বিসর্জন দিয়ে নয়। এইখানে পশ্চিমী ভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বড় তফাত। তাহলে গ্রাম পুনর্গঠন করে আমরা কী পাব? আমরা পাব সমষ্টির শক্তিতে উজ্জীবিত একটা সমাজ, আমরা পাব সামাজিক অন্ধকার মুক্ত এক সমাজ, আর আমরা পাব এমন এক মানুষ, যে শুধু রক্ত-মাংসে মানুষ তাই নয়, পারস্পরিক প্রেম, শ্রদ্ধা ও মনুষ্যত্বের পরীক্ষায় পাশ করা এক মানুষ এবং এই উজ্জীবিত মানুষ আর সমাজের আধার হবে ওই সমবায়গুলি।

রবীন্দ্রনাথের ভাবনামতো শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের চারপাশে ৪৭টি গ্রামে নানা পরীক্ষানীরিক্ষা হয়েছিল। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চরিত্র গঠন, পরিকাঠামো উন্নয়ন, শিশু উন্নয়ন, সংস্কৃতি, নারী ক্ষমতায়ন, গ্রাম-সমাজের শাসন অনেকগুলি দিকে ওই পরীক্ষানিরীক্ষার ছবি

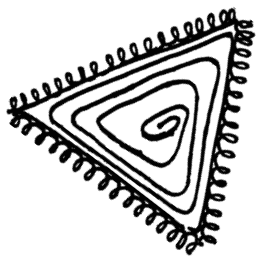

দেখতে পাওয়া যায়। এককথায় বললে সেই পরীক্ষানিরীক্ষার মূল আধার ছিল সেই সমবায়গুলি। অনেকে বলেন যে তিনি ইংল্যান্ড আর ডেনমার্কের সমবায়গুলি দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সে কথাটা ঠিক, কিন্তু মনে রাখতে হবে, ওদেশের সমবায়গুলি ছিল উৎপাদন আর বিপণন কেন্দ্রিক, রবীন্দ্রনাথের সমবায়গুলি শুধু তা ছিল না।

সমবায়গুলি তাঁর কাছে ছিল গ্রামের মানুষের সমষ্টি প্রতিষ্ঠান। পরিবারের বাইরে যেসব সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে মানুষের জীবন এগিয়ে চলে, সেই সিদ্ধান্ত নেবার গ্রামীণ স্থায়ী সমিতি হিসেবে সমবায়গুলিকে দেখেছিলেন তিনি। এইসব কাজের মধ্যে তাঁর যে মূল দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছে, সেটা কী? খুব স্পষ্ট করেই তিনি বলেছেন পশ্চিমে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে তাঁর

তিনি স্পষ্ট বিশ্বাস করতেন রাষ্ট্র মানুষ তৈরি করে না, মানুষ তৈরি করে সমাজ, তাই তাঁর কাছে গ্রাম পুনর্গঠনের কাজ আসলে ছিল মানুষ তৈরির প্রকল্প

আগ্রাসী মনে হয়েছে, মানব মুক্তির বিরোধী মনে হয়েছে। তিনি কখনই চান নি যে ২৫০০ বছরের দেশ ভারতবর্ষ পশ্চিমের অনুকরণে রাষ্ট্রের হাতে মানুষ চালনার সামগ্রিক ভার সঁপে দিয়ে বসে থাকুক। আধুনিকতাকে যেমন তিনি অনেক ক্ষেত্রেই বরণ করেছেন, রাষ্ট্রের অমোঘতাকে নিঃশর্তে বরণ করেননি। রাষ্ট্রের ভূমিকাকে তিনি কখনই অস্বীকার করেন নি, তিনি রাষ্ট্রের পাশাপাশি সমাজের একটা নিজস্ব শক্তি তৈরি করতে চেয়েছিলেন, সমবায়ী মননের ভিত্তিতে। শুধু তাই নয়, সভ্যতার পরম্পরা যেহেতু মূলত টিকে আছে গ্রামে তাই সমাজের শক্তিটিকেও তিনি গ্রামেই উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন।

রাষ্ট্রের শক্তি আর সমাজের শক্তি যে আলাদা দুটি বিষয়, পশ্চিমের সমাজের শক্তিটা হারিয়ে গেছে, রাষ্ট্র তার ডালপালা মেলে মানুষের জীবনের সব অঙ্গই দখল নিয়েছে এবং তার ফল যে ভালো হয়নি, সেটা রবীন্দ্রনাথ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছিলেন। তিনি স্পষ্ট বিশ্বাস করতেন রাষ্ট্র মানুষ তৈরি করে না, মানুষ তৈরি করে সমাজ, তাই তাঁর কাছে গ্রাম পুনর্গঠনের কাজ আসলে ছিল মানুষ তৈরির প্রকল্প।

বাজারের ভূমিকা সম্পর্কেও তিনি অজ্ঞ ছিলেন না। এখানেও তাঁর একটি বিশেষ ভাবনা কাজ করেছে। বাজার ব্যবস্থার মধ্যেও তিনি বৃহৎ পুঁজির আগ্রাসন রুখতে চেয়েছিলেন। গ্রামীণ পুঁজির নিজস্ব বাজার তৈরি করা তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। সমবায়গুলির মধ্যে আদানপ্রদান আর ব্যক্তি বা পারিবারিক উদ্যোগে তৈরি গ্রামীণ জিনিসপত্রের বাজার যাতে বিকশিত হতে পারে, তার
জন্য গ্রামীণ বাজারের পরিকাঠামো তৈরি করা তাঁর গ্রাম পুনর্গঠনের কাজের মধ্যে পড়ে। পৌষমেলা-মাঘমেলা তার প্রমাণ। শুধু তাই নয়, শিল্প সদনের মাধ্যমে বিশ্বভারতীর সঙ্গে গ্রামীণ বাজারের যে সংযোগ তিনি তৈরি করতে চেষ্টা করেছিলেন তার তুলনা মেলা ভার। তবে আধুনিক সংঘবদ্ধ বৃহৎ উৎপাদন ব্যবস্থার যে সুফল আছে তাকে তিনি অস্বীকার করতে চাননি। তিনি বুঝতেন যে সংঘবদ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থায় জিনিসের দাম কমে, তা গরিবের কাছে পৌঁছায়। স্বাদেশিকতার নামে গ্রামীণ বাজারে তার সুফলগুলি আটকানোর কোনো অপচেষ্টা তিনি করেননি। তবে সাবধান করেছেন বারবার। এখানে তাঁর মনে একটা দ্বন্দ্ব কাজ করেছে বলে মনে হয় আমার।

শিক্ষা-স্বাস্থ্য-নারী উন্নয়ন-রোজগার-বাজার তৈরি নিয়ে যে মাতামাতি এখন দেখতে পাই, তার পথিকৃৎ হিসেবে সহজেই রবীন্দ্রনাথকে ভাবা যেতে পারে, যদিও তা ভাবা হয় না। গ্রামীণ শিক্ষার যে কাঠামো তিনি তৈরি করলেন, তা নিয়ে পরে আরো অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে আমাদের দেশে গত চার দশক ধরে এবং যাঁরা সেই পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন তাঁরা সবাই রবীন্দ্র ভাবনার ঋণ স্বীকার করেন, কিন্তু দেশের মূলস্রোতের শিক্ষা-ধারা ঔপনিবেশিক ধারা থেকে বেরোয় নি। সবে এখন মূলস্রোতও স্বীকার করছে যে বিকল্প শিক্ষা ধারার প্রয়োজন আছে। স্বাস্থ্যের ব্যাপারেও তাই, পশ্চিমী চিকিৎসা ধারার পাশাপাশি, সাবেকি আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি আর বায়োকেমিক চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি তাঁর ভরসা ছিল। তাঁর তৈরি স্বাস্থ্য-সমবায়গুলিতে এর উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। আমাদের স্বাস্থ্য-নীতিতে এইসব চিকিৎসা-ধারা বহু দশক যাবৎ ব্রাত্য ছিল, সবে এখন স্বীকৃতহয়েছে। গ্রামীণ রোজগার বাড়ানোর জন্য গ্রামীণ বাজারের ভূমিকাতেও তিনি পথিকৃৎ। খুব সম্প্রতি রুরাল বিজনেস হাব (Rural Business Hub) বলে একটা আইডিয়া খুব প্রচলিত হয়েছে। এগুলি যাঁরা করেছেন তাঁরা জানেনই না যে, এ ধরনের কাজ ৮০-৯০ বছর আগে হয়ে গেছে।

এইসব নানা আপাত-মিলের জন্য আমাদের মনে হতে পারে বর্তমানের উন্নয়নের ভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্র ভাবনার অনেক মিল আছে। প্রায়শই আমরা শুনতে পাই যে, আমাদের দেশে এখনকার উন্নয়নের কর্মকাণ্ডের প্রায় সবটাই একদিকে মহাত্মা গান্ধী আর অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী। আমার কিন্তু তা একেবারেই মনে হয় না। বর্তমানের উন্নয়ন ভাবনার মূল আর রবীন্দ্রনাথের গ্রাম পুনর্গঠনের ভাবনার মূলে অনেক ফারাক, আর সে ফারাক বর্তমানের সর্বজনীন দর্শন আর রবীন্দ্রনাথের মানবদর্শনের মধ্যে নিহিত। তিনটে মূল তফাত দেখতে পাই ১। গ্রাম উন্নয়নে রাষ্ট্রের মূল ভূমিকা নিয়ে। ২। বাজারের চরিত্র আর তার বৃহৎ ভূমিকা নিয়ে, আর ৩। মানব সম্পর্কের ভিত্তি নিয়ে।

রাষ্ট্র আর বাজারের বৃহৎ ভূমিকা, যে রকম ভূমিকা পশ্চিমে সর্বজনস্বীকৃত, তাকে রবীন্দ্রনাথ আগ্রাসী ভূমিকা বলেছেন। তিনি তাকে মানব মুক্তির পরিপন্থী বলে মনে করেছিলেন। তার বিপরীতে মনুষ্যত্ব, প্রেম, শ্রদ্ধার ভিত্তিতে এবং সমবায়ী মননের ভিত্তিতে তিনি সমাজকে আরো সুদৃঢ় করতে চেয়েছিলেন। রাষ্ট্র ও বাজারকে সমাজের অঙ্গ হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন তিনি, সমাজের হর্তাকর্তা হিসেবে নয়। এটা একটা মূল তফাত। এইখানে আগে যে কথা বলছিলাম, বর্তমান ভাবনার মধ্যে গলদের কথা, সেকথায় ফিরে আসি। গলদ দুটো জায়গায় দেখতে পাই। বর্তমানের দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষ তৈরির কোনো প্রকল্প নেই, যা আছে, তা সবই ব্যবস্থা তৈরির প্রকল্প, আইনের ব্যবস্থা, অধিকারের ব্যবস্থা, আইন রক্ষা ও ভাণ্ডার ব্যবস্থা, বাজারের স্বাধীনতার ব্যবস্থা, স্বচ্ছতা তৈরির ব্যবস্থা, দায়বদ্ধতা তৈরির ব্যবস্থা, পরিষেবা দেবার ব্যবস্থা ইত্যাদি। মানুষ তৈরি নিয়ে বর্তমানের কোনো ভাবনা দেখছি না। রবীন্দ্রনাথের মূল ভাবনা ছিল গ্রাম পুনর্গঠনের মাধ্যমে যথার্থ মানুষ তৈরির প্রকল্প। আর একটা গলদ সমাজ তৈরি নিয়ে। বর্তমানের ভাবনায় সমাজ তৈরির প্রকল্প একটা আছে, কিন্তু আসলে

সেটা গৌণ। আইন ও বাজারি ব্যবস্থা নির্ভর সমাজ একটা চাই বটে কিন্তু তা দিয়ে যে সমাজ হয় না, তা স্বীকার করি না আমরা। সমাজ তৈরি করতে গেলে একটা সমবায়ী মনন লাগে, কিছু বিশ্বাস লাগে, সংস্কৃতি লাগে, কিছু আচার লাগে, ত্যাগ লাগে, বৃহৎ অর্থে প্রেম লাগে, অনুষ্ঠান লাগে, কিছু অনুশাসন লাগে। আইন দিয়ে শুধু অনুশাসনটাই হয়, বাকিটা হয় না। মানুষের জীবনের দায়িত্ব রাষ্ট্র পুরোটাই হাতে তুলে নেবে এটা যেমন রবীন্দ্র আদর্শের বিরোধী, তেমনিভাবে বৃহৎ পুঁজি বাজারের দখল নিয়ে নেবে, এটাও রবীন্দ্র আদর্শের বিরোধী। রাষ্ট্র আর বাজার থাকবে নিশ্চয়ই, কিন্তু তা থাকবে সমাজের অঙ্গে, অভ্যন্তরে। সমাজটা হয়ে গেল গৌণ, রাষ্ট্র আর বাজার হয়ে গেল মুখ্য এটা তাঁর কাছে একেবারেই কাম্য ছিল না। সমাজের মূল শক্তিটা যেহেতু টিকে আছে গ্রামেই, তাই তিনি পুনর্গঠনের মাধ্যমে সেই শক্তিটিকেই উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। রাষ্ট্র আর বাজারকেন্দ্রিক মানুষ পূর্ণ মানুষ নয়, আসলে একটা অ্যাটমাইজড (atomized) জীব, মানুষ পূর্ণতা পাবে সমাজের শক্তিতে, এই বিশ্বাস তাঁর ছিল।

রবীন্দ্রনাথের কাছে আমরা ঋণী কারণ রাষ্ট্র আর বাজারের সার্বিক আগ্রাসী ভূমিকার বিপদগুলি কী তা তিনি তাঁর লেখা আর কাজে স্পষ্টই দেখিয়েছেন। আগামীদিনে সুস্থ দেশ ও সমাজ গড়তে গেলে রাষ্ট্র ও বাজারের বর্তমানের সর্বময় ভূমিকা অনেক কমতে হবে, এই কথা আজ অনেকেই বলছেন। এখন বেশ দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্র, বাজার আর সমাজের মধ্যে একটা ভারসাম্য না আসলে মানুষ তৈরির প্রকল্পটাই বাকিথেকে যায়। তাই সার্ধশতবর্ষে তাঁর সেই ভাবনাগুলি আর একবার ঝালিয়ে নেবার সময় এসেছে। রবীন্দ্রভাবনার প্রাসঙ্গিকতা এইখানে। ■■

ড.অশোক সরকারের পড়াশোনা ও গবেষণা পদার্থবিদ্যা ঘিরে। বিকল্প উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত আছেন বহুদিন। বিষয় পঞ্চায়েতিরাজ, নাগরিক সমাজ ও সামাজিক উন্নয়ন। এছাড়া বিপর্যয় মোকাবিলা, স্বনির্ভর দল এবং মাইক্রো ফাইনান্স বিষয়েও কাজ করেছেন।

আম আদমি বিমা যোজনা

এবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা বিমার সুবিধার কথা বলব। বিমাটার নাম **আম আদমি বিমা যোজনা**। এর সুযোগ পাবেন খালি ভূমিহীন খেতমজুররা। আগে, **প্রফলাল প্রকল্পে** যাঁরা নাম লিখিয়েছিলেন তাঁরাই এই প্রকল্পের আওতায় এমন কথা বলা ছিল। তবে এখন সব ভূমিহীনই এই সুযোগের এক্তিয়ারে। ভূমিহীন খেতমজুর পরিবারের প্রধান বা পরিবারের রোজগেরে একজনের নামে এই বিমা করা যাবে।

কী সুবিধে

কোনো ভূমিহীন পরিবারের বিমায় বিধিবদ্ধ মানুষটির স্বাভাবিক মৃত্যু হলে, বিমা অনুযায়ী পরিবারটি ৩০ হাজার টাকা পাবে। আর এই মৃত্যু দুর্ঘটনাজনিত হলে, পরিবার বা পরিবারের যে নমিনি সে পাবে ৭৫ হাজার টাকা। আবার বিমায় বিধিবদ্ধ মানুষটি স্থায়ীভাবে অংশত পঙ্গু হলে, মানে তার এক চোখ নষ্ট বা একটি অঙ্গ বিকল হলে, সে পাবে ৩৭ হাজার ৫০০ টাকা আর পুরো বিকলাঙ্গ হলে মানে, তার দুচোখ নষ্ট বা দুই অঙ্গ অচল হলে সে পাবে ৭৫ হাজার টাকা।

এর পাশাপাশি ভূমিহীন পরিবারের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির দুজন ছেলেমেয়ে মাসিক ১০০ টাকা করে বৃত্তি পাবে। এই বৃত্তির অর্থ দেওয়া হবে বিদ্যালয় মারফত। তবে সেক্ষেত্রে আগের ক্লাসে কোনোভাবে সেই ছেলেমেয়ের ফেল করা চলবে না।

প্রিমিয়াম

বিমাকারির জন্য বছরে প্রিমিয়াম বাবদ জমা পড়বে ২০০ টাকা। যার ১০০ দেবে কেন্দ্রীয় সরকার, আর ১০০ টাকা রাজ্য সরকার। বিমাকারিকে সরাসরি কোনো টাকা জমা করতে হবে না।

কীভাবে আবেদন করা যাবে ?

যাঁরা স্থায়ী প্রতিবন্ধী বা আংশিক প্রতিবন্ধী তাদের জন্য নির্দিষ্ট ছককাটা আবেদনপত্র আছে। আবেদনপত্রের সঙ্গে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের অধীনে একটি চিকিৎসকমণ্ডলীর দেওয়া প্রমাণপত্রও জরুরি। ব্যক্তির মৃত্যুর ক্ষেত্রেও বিমার জন্য ছককাটা আবেদনপত্র আছে। এর সঙ্গেও উপযুক্ত চিকিৎসা আধিকারিকের প্রমাণপত্র ও মৃত্যু নিবন্ধীকরণ-প্রমাণপত্র জরুরি। উভয়ক্ষেত্রেই বিমাপ্রার্থীর আবেদন আসবে বিডিও মারফত।

মেধাবৃত্তির জন্য আবেদন

এই জন্যও একইভাবে ছককাটা আবেদনে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরে দরখাস্ত করতে হবে। এই আবেবদন জমা পড়বে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বিডিও মারফত। আবেদনপত্রে প্রধান শিক্ষকের সম্মতিসূচক স্বাক্ষর থাকবে।

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর তিনমাস অন্তর এই বিমার উপযোগী প্রার্থী তালিকার পরিমার্জনা করবেন। এই বিমা ভারতীয় জীবন বিমা নিগম-এর এক প্রকল্পেরই অংশ। ■■

মরশুমের মাঠের খবর

পশ্চিমবঙ্গে এবার বৃষ্টির ঘাটতি তিরিশ শতাংশেরও বেশি। কলকাতা, দুই চব্বিশ পরগনাসহ এগারোটি জেলা খরা-কবলিত। মাঠ ও বাগানের চাষ নিয়ে এক এক করে বলি:

• মাঠে এখন মূলত পয়রা এবং মিশ্রচাষ করা যেতে পারে। ধানজমির রস কাজে লাগিয়ে পয়রা করে খেসারি, সরষে, তিসি করা যায়। খেসারি দিতে হবে বিঘা প্রতি ৮-১০ কেজি, ধান কাটার ১৫ দিন আগে। সরষে বিঘা প্রতি ১ কেজি ২৫০ গ্রাম, ধান কাটার ৫ দিন আগে। নাইজার বা মাগা (উত্তরবঙ্গে যা সরগুজা) বিঘা প্রতি ১ কেজি ২৫০গ্রাম ধান কাটার ৩-৫ দিন আগে। তিসিও একই পরিমাণে একইভাবে।

মিশ্র চাষ হতে পারে গম,সরষে,মুসুর, মটর, তিসি,ছোলা প্রভৃতি। জীবাণুসার হিসেবে রাইজোবিয়াম ব্যবহার করা দরকার। এছাড়া ডাঙা জমিতে অ্যাজোটোব্যাক্টর এবং পিএসবি ব্যবহার করা দরকার।

শুষ্ক অঞ্চলে যেখানে হাপা কেটে (২০'x২০'x১৬') মাটির তলা দিয়ে বয়ে যাওয়া বৃষ্টির জল ধরে রাখা হয়েছে, সেখানে মিশ্র চাষের পাশাপাশি লতানে সবজি বরবটি,কুমড়ো, বিন পেঁয়াজ ইত্যাদি চাষ করা যায়। এইভাবে একফসলি জমিগুলিকে দোফসলিতে রূপান্তর করা যায়।

• বোরো চাষে আগ্রহীরা SRI বা শ্রী পদ্ধতিতে চাষ করলে বেশি লাভ পাবেন। এই পদ্ধতিতে বীজ কম লাগে (বিঘা প্রতি ৮০০-গ্রাম ১ কেজি) জল কম লাগে, রোগপোকা কম লাগে, সাধারণ পদ্ধতি অপেক্ষা ফলন অনেক বেশি। এই চাষের জন্য বীজতলা করতে এক বিঘের জন্য লাগে ১৩ বর্গমিটার জমি। বেডের উচ্চতা হবে ৬ ইঞ্চি। চারার বয়স (১০+২) দিন।

রবি মরশুমকে সবজির মরশুম মনে করা হয়। এই মরশুমে বাগানে বেড পদ্ধতিতে মিশ্র ফসল চাষ করা যায়।

• যেখানে জল কম সেখানে বিন্দু সেচ করা যায়। যেমন কলসি সেচ, বাঁশসেচ, ড্রামকিট ইত্যাদি।

চাষের কথা

• চারা তৈরির জন্য সবজি নার্সারি করা যায়। সেক্ষেত্রে বেড বা বাতিল পাত্র ব্যবহার করা যায়। বেডে মাটি ও জল সংরক্ষণের জন্য আচ্ছাদন ব্যবহার করা দরকার। জৈব সার (কম্পোস্ট, কেঁচোসার, তরলসার) ব্যবহার করা দরকার।

• রবি মাশরুম চাষের উপযুক্ত। এই চাষ বেড অথবা প্রমাণ সাইজের প্লাস্টিকের ব্যাগে করা যায়। এক প্যাকেট স্পন থেকে ১ কেজি—১.৫ কেজি মাশরুম পাওয়া যায়।

ছবি : অভিজিত দাস

• খরা এলাকায় প্রাণীপালনের উপর জোর দেওয়া দরকার। দেশি মুরগি, ছাগল, ভেড়া পালন করা যায়।

মিশ্র চাষে শস্যের পরিমাণ :

গম (১/২) বিঘা - .৬-৭ কেজি
সরষে ৫ কাঠা .২৫-৩৫ কেজি
- ছোলা ৫ কাঠা -১.৫ কেজি

গম ১/২ বিঘা - ৬-৭ কেজি
সরষে ৫ কাঠা-.২৫-.৩৫ কেজি
মুসুর-৫ কাঠা-১-১.২৫ কেজি

গম -১/২ বিঘা- ৬-৭ কেজি
সরষে-৫ কাঠা-.২৫-.৩৫ কেজি
মটর-৫ কাঠা-২ কেজি

গম ১/২ বিঘা - ৬-৭ কেজি
তিসি ৫ কাঠা - .৩০-.৩৫ কেজি
মুসুর-৫ কাঠা -১-১.২৫ কেজি

গম - ১/২ বিঘা - ৬-৭ কেজি
ছোলা-৫ কাঠা ১.৫০-১.৭৫ কেজি
তিসি-৫ কাঠা .২৫-৩৫ কেজি

গম ১/২ বিঘা - ৬-৭ কেজি
তিসি ৫ কাঠা -.২৫-.৩৫ কেজি
মটর ৫ কাঠা - ১-১.২৫ কেজি।

■■

আরও জানতে ফোন করুন :
৯৪৩৩৩৯০৮২৯ | ৯৮৩৬৯৫২৩৮১

চাষের কথার পুরোনো সংখ্যা আমাদের গ্রন্থাগার-সংগ্রহে আছে। উৎসাহী পাঠক যোগাযোগ করতে পারেন। প্রয়োজনে সংগ্রহ করতে পারেন জেরক্স প্রতিলিপি

সাট্‌সা মুখপত্র এপ্রিল ২০১০

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি উন্নয়ন আধিকারিকদের একটা কেন্দ্রীয় সমন্বয় আছে। সমন্বয়ের নাম 'সাট্‌সা'। সাট্‌সা মানে স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্ট সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন। এরা একটা পত্রিকা বার করে। পত্রিকার নাম 'ত্রৈমাসিক সাট্‌সা মুখপত্র'। এই পত্রিকা এপ্রিল ২০১০-এ একটা 'বিশেষ প্রযুক্তি সংখ্যা' করেছে। প্রযুক্তি বলতে—কৃষি প্রযুক্তি।

সংখ্যায় লেখা পাঁচটি। তার ভেতর বাংলার আয়লাগ্রস্ত এলাকার মাটির লবণ সমস্যার সুরাহা নিয়ে লিখেছেন রথীন্দ্রনারায়ণ বসু, জিন ফসল-বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা ও ভারতীয় কৃষি নিয়ে লিখেছেন মুরারি যাদব ও অনুপম পাল, দারিদ্র দূর—প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সুস্থিত কৃষি নিয়ে লিখেছেন তরুণকুমার বসু। রাজ্য কৃষি কমিশনের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করেছেন রথীন্দ্রনারায়ণ বসু। তবে সবচেয়ে জরুরি মনে হয় শ্রী বসুর IASSTD-র মূল্যায়ন নিয়ে শেষ লেখাটা। বলা ভালো এই সংখ্যায় রথীন্দ্রনারায়ণ বসুর লেখা আছে তিনটি। IASSTD-র পুরোটা হল International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development। এই কাজের পেছনে ছিল রাষ্ট্রপুঞ্জ ও বিশ্বব্যাঙ্ক, সঙ্গে ৫৮টি দেশের সমর্থন। IASSTD-র প্রতিবেদনটি বেশ বিস্তারিত। পাতা সংখ্যা ২,৫০০ —সবাই তা পড়তে পায়নি। এই লেখায় ধারণাটি গুছিয়ে স্পষ্ট করে বলার চেষ্টা হয়েছে। তথ্যকে ৭৮টি ভাগে ভাগ করে বলা হয়েছে। নীতি-নির্ধারকদের জন্য সারাংশ দেওয়া হয়েছে ২২টি ভাগে। সব মিলে এই লেখার পাতা সংখ্যা চুয়াল্লিশ। অন্য লেখাগুলির ভেতর জিন ফসলের লেখাটি ১৭ পাতা, কৃষি কমিশন ৩৯ পাতা, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও সুস্থিত চাষ ৬ পাতা, আয়লা নিয়ে রচনাটি ১২ পাতা। আয়লার লেখাটি আবার ছবি দিয়ে, নকশা দিয়ে বোঝানো আছে। কৃষি কমিশন নিয়ে লেখাতে আছে ১০টি সারণি— সাম্প্রতিক কৃষি উৎপাদন, আগামী ২০২৫ অব্দি ঘাটতি-উদ্বৃত্তের সম্ভাব্য পরিমাণ, দুধ-মাংস-খামার ফসল একইভাবে এই সবকিছুরই। সবমিলে পত্রটি ১২০ পাতার। সম্পাদনা করেন সাট্‌সার পক্ষে গোষ্ঠ ন্যায়বান। দাম ২০ টাকা।

■■

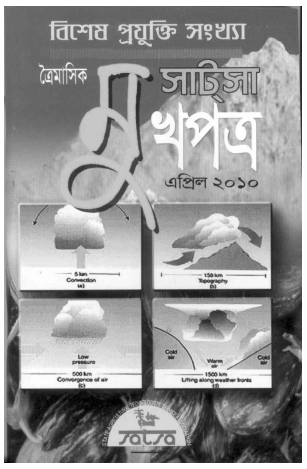

যোগাযোগ :
সাট্‌সা ৮ ডি কৃষ্ণ লাহা লেন, কলকাতা ১২

ইমেল:satsa.wb@gmail.com

লাউ

Lagenaria siceraria (Cucurbitaceae)

লাউ সবজি হিসেবে চাষ করা হয়। এর ডগা ও পাতাও শাক হিসেবে অনেকেই খায়। লতানে গাছ। গরম ও শীতকালে হয়। আষাঢ়-শ্রাবণ ফাল্গুন-চৈত্র মাসে আর ডাঙা জমিতে বীজ লাগাতে হয়। লাউয়ের ডাঁটা মুগ ডালে দিয়ে ও পাতা তরকারি করে খাওয়া যায়। প্রস্রাব করায়। পাতার রস ৪ চা চামচ চিনি মিশিয়ে পান করলে যকৃৎ ভালো করে। ন্যাবাতেও (জন্ডিস) উপকার হয়। বিষাক্ত পোকামাকড় কামড়ালে এর রস লাগালে যন্ত্রণা কমে।

লাউয়ের দেশি প্রজাতিগুলি মাচায় বা চালে উঠে ছড়ায় ও প্রচুর ছোট ছোট ফল দেয়। এই প্রজাতিগুলি হারিয়ে যেতে বসেছে, এদের বীজ সংগ্রহ করা ও ছড়িয়ে দেওয়া জরুরি।

■■

সূত্র : বাংলার শাক

জীবাণু সারের প্রসার ও চাষির কেঁচোসার ব্যবসা

কাজলায় কেঁচোসার-জীবাণুসার নিয়ে ভালো কাজ হয়েছে। কাজলা হল কাজলা জনকল্যাণ সমিতি। এই সংগঠনটি পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে। কেঁচোসার নিয়ে এখানে ব্যবসাও ভালো হচ্ছে। এইজন্য একটা বায়োল্যাবও বানানো হয়েছে। ল্যাবটি জনকল্যাণ সমিতির অফিসেই।

এখানে এই কাজ শুরু ১৯৯৫-এ। ল্যাব তৈরি হয় এই বছরেই। এইজন্য সার্ভিস সেন্টারের অর্থ সাহায্য আসে। বায়োল্যাবে জীবাণুসার বানানো হয়। অ্যাজোটোব্যাক্টর বানানো হয়, পিএসবি বানানো হয়। প্রথমে বানানো হয় অল্প অল্প। উৎপাদন পরখ করা হয় কাজলার ডেমো প্লটে। পরীক্ষা সফল হয়। তারপর ল্যাব থেকে চাষিদের নিখরচায় জীবাণুসার দেওয়া শুরু হয়। বিঘা প্রতি ৬০০ গ্রাম করে দেওয়া হয়। ১৯৯৭-৯৮ থেকে নিখরচার বদলে চাষিদের থেকে উৎপাদন খরচ বাবদ টাকা পয়সা নেওয়া শুরু হয়। তবে নির্দিষ্ট মূল্য নয়, চাষিরা যে যেমন পারে তেমন করে টাকা পয়সা নেওয়া শুরু হয়। আস্তে আস্তে উৎপাদন বাড়ে, আরো যন্ত্রপাতি কেনা হয়। ২০০০ নাগাদ জীবাণুসার দিয়ে প্রচার করতে ল্যাবের উদ্যোগে স্বনির্ভর দলগুলোয় পাঠচক্র শুরু হয়। এর মধ্যে ল্যাবে কাজ করবে এমন ৫ উদ্যমীকে সার্ভিস সেন্টারের শ্যামনগর কেন্দ্রে কেঁচোসার-জীবাণুসার নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সঙ্গে মাশরুমও ছিল। ২০০৪-০৫ নাগাদ ল্যাবটি ভালোভাবে দাঁড়িয়ে যায়। ২০০৬ নাগাদ কেঁচোসার উৎপাদন শুরু হয়। এখন ওখানে কেঁচোসার বিক্রি হয় প্যাকেটে করে। এই প্যাকেট আলাদা করে ছাপা হয়েছে। ২০০৯-এ ল্যাবের আয় ১ লক্ষ ৩০ হাজার দিয়ে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়। তার থেকে ৫০ হাজার ঋণ নিয়ে কেঁচোসার ইউনিট তৈরি। এই টাকা আগে জনকল্যাণ সমিতির অ্যাকাউন্টে ছিল। মাসে এখান থেকে উৎপাদন ৩৫০ কুইন্ট্যাল। এইজন্য দু ধরনের ট্যাঙ্ক আছে। একটা ১মি. x১ মি.অন্যটা ২ মি. x ১ মি.।

বছর ৩-৪ আগে অব্দি ল্যাবের সঙ্গে গড়ে ২০০ থেকে ৩০০ চাষির লেনদেন হত। এখন এই সংখ্যা ১২০০ থেকে ১৫০০-এ দাঁড়িয়েছে। ২০০৫-২০০৬-এ তৈরি হয় আরো ৪টে ইউনিট—ওলমা-তিওরখালি-ঘোড়াঘাটা-কুলতলিয়া। ওলমার ল্যাব পরে চলে যায় জালালপুরে। এইসব ইউনিটে কেঁচোসার হয়। কাজলা জনকল্যাণ সমিতির ৩০টি স্বনির্ভর দলও কেঁচোসার বানাচ্ছে। চাষিরা উৎসাহী হয়েছে। কিশোর কিশোরী বাহিনীও কেঁচোসার বানানো শিখছে।

কাজলার পূর্ব রামচন্দ্রপুরের চাষি উত্তম চক্রবর্তী ২ বছর আগে জনকল্যাণ সমিতিতে কেঁচোসার প্রশিক্ষণ নিয়ে এখন নিজে উৎপাদন করছেন। এইজন্য তিনি জাতীয় উদ্যানপালন মিশনের অর্থ সাহায্য পেয়েছেন। এই সার তিনি নিজে ব্যবহার করেন, অন্যকে বিক্রিও করেন। গ্রামের ৩০-৩৫ জন চাষি উত্তমের থেকে সার কেনেন। বছরে তাঁর উৎপাদন ১৬-১৭ টন। চাহিদা হলে নোডাল ল্যাবেও দেন। কাশিমিলি গ্রামের পশুপতি পাট্টাও একইভাবে সমিতি থেকে শিখে সার বানাচ্ছেন, ব্যবহার করছেন, বিক্রি করছেন। তাঁর উৎপাদন ১৮-২০ কুইন্ট্যাল। তিনি ১০ কুইন্ট্যালের মতো বিক্রি করেন। নোডাল ল্যাবও ওনার কাছ থেকে কেনে। জালালপুর বায়োল্যাবের কর্মী সুবিমল বেজও বাড়িতে কেঁচোসার বানিয়ে বিক্রি করছেন। তাঁর হয় ১২ কুইন্ট্যালের মতো, বিক্রি করেন ৭-৮ কুইন্ট্যাল। মাতঙ্গিনী মহিলা দল কেঁচোসার তৈরি করছে গত ৭ মাস। তাঁদের ২০০০ টাকা অব্দি আয় হয়েছে। মাতঙ্গিনীর মহিলারা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন নোডাল ল্যাবেই। বায়োল্যাব দেখাশোনার জন্য কাজলার আলাদা কমিটি আছে। ফি মাসে নিয়মিত ল্যাবে মিটিং হয়, বাকি ৪ ইউনিটকে নিয়ে বসা হয়। বায়োল্যাবের বিদ্যুৎ খরচ বাবদ কাজলাকে প্রতিবছর ১০ হাজার টাকা করে দিতে হয়। জেলায় ল্যাবের সারের বিপুল চাহিদা। জেলা কৃষি বিভাগ থেকে ল্যাব ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার কেঁচোসারের বরাত পেয়েছে। সরকারিভাবে বিধিবদ্ধ হলে ও ট্রেড লাইসেন্স থাকলে ল্যাবের এই বরাত বাড়ত। চাহিদা আছে বীরভূম ও পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামেও। কেঁচোসার নিয়ে লিফলেট পোস্টার ইত্যাদি নানা প্রচার-উপকরণও বানানো হয়েছে।

বায়োল্যাবের পক্ষে কেঁচোসার, জীবাণুসার নিয়ে মেলায় মেলায় প্রদর্শনী-পদযাত্রা চলছে। এই নিয়ে অংশ নেওয়া হয়েছে এগরা ও হলদিয়া মেলায়। ■■

তথ্য সংগ্রহ :
আগস্ট ২০১০
তথ্য সহায়তা :
দেবাশিস মিত্র, শোভন কান্ডার কেজেকেএস

চাই কিষান স্বরাজ

১৯ নভেম্বর ২০১০ কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল বীজ উৎসব। আয়োজক ASHA-র পক্ষে ডিআরসিএসসি। কৃষকের অধিকার ও কৃষিকে বাঁচানোর লক্ষ্যেই তৈরি ASHA। যার পুরো নাম Alliance For Sustainable & Holistic Agriculture। এই সমন্বয় দেশজুড়ে এক বাসযাত্রা করছে। শুরু হয়েছে ২ অক্টোবর সবরমতীতে, শেষ হবে ১১ ডিসেম্বর রাজঘাটে। বীজ উৎসব এই প্রয়াসেরই অঙ্গ। কলকাতার এই উৎসবে কৃষি ও কৃষক অধিকার নিয়ে মিছিল, গান্ধী মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ, সাংবাদিক সম্মেলন, সই সংগ্রহ, বীজ প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনার কার্যক্রম ছিল। আলোচনায় অংশ নেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য রথীন্দ্রনারায়ণ বসু, অধ্যাপক তরুণকুমার বসু প্রমুখ।

স্বরাজ যাত্রায় অংশ নিয়েছেন ৩০ জন কৃষক। বাসযাত্রা চলছে ২০টি রাজ্য জুড়ে। যাত্রার দাবি জিনশস্য রদ, ফসলের ন্যায্য মূল্য, কৃষিজমি দখল রোখা, খেতমজুরের ন্যায্য মজুরি, কৃষিতে এনআরজিএস-এর ব্যবহার, বহুজাতিকের খবরদারি রোধ, জৈব কৃষি ফেরানো, পরিবেশ বাঁচানো ইত্যাদি।

বিরুদ্ধতার চাবুক...

বিটি বেগুনের পর কৃষকের রাগ গিয়ে পড়েছে বিটি ধানে। বিটি ধানের খেত কৃষক জ্বালিয়ে দিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে খোদ ব্যাঙ্গালোরে। ওখানে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র খামারে জিএম ধানের পরীক্ষা হয়েছিল। কৃষকরা জানতে পেরে ওই ধানের কিছুটা আগুন দিয়ে দেয়। জিএম ধান নিয়ে কর্ণাটকের কৃষকরা সরব বেশ কিছুদিন। কর্ণাটক রাজ্য রায়তি সংঘ এই নিয়ে জোর কদমে প্রচার চালাচ্ছে। এইসব খবর দিল টিএনএন ১৮ নভেম্বর ২০১০।

বিজয় মিছিল !

উত্তরাখণ্ডে দেশি বীজের চল বাড়ছে। এই বীজের ভেতর ধান, রাজমা, মাড়োয়া, গম ইত্যাদি আছে। এই বীজের চল বাড়ানোর পেছনে আছেন বিজয় জাদ্ধারি। জাদ্ধারি ওখানে এই বীজ বাঁচাওকে আন্দোলনে পরিণত করেছেন। এইভাবেই উত্তরাখণ্ডের রাসায়নিক সার কমবে, জৈব বৈচিত্র বাঁচবে, এমনই ভেবেছেন তিনি। খবর দিচ্ছে ডেলি পায়োনিয়ার ১২ মে ২০১০।

কর্ণাটকী

কর্ণাটকে তুলো চাষ সমস্যায়। সমস্যা ওখানে দেশি তুলোবীজের ঘাটতিতে। এই ঘাটতি বিশেষ করে কর্ণাটকের মাইসোর জেলার এইচ ডি কোটে এলাকায়। এখানে সবই বিটি তুলোবীজ। সমস্যা ওখানে অন্য এলাকাতেও। রায়চুড়, হাভেরি, হুবলি, নাঞ্জাগুড় সর্বত্রই একই কথা, চার এলাকাতেই বিটি বীজ নেওয়ার জন্য জবরদস্তি চলছে। খবর দিচ্ছে হিন্দু ১৪ নভেম্বর ২০১০।

Ctrl. S গ্রাম

সরকার গ্রামে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা ছড়াতে চাইছে। এইজন্য কমপিউটার ভাড়া পাওয়া যাবে। ভাড়া দিনে ১৫-২০ টাকা। এই কাজ পরীক্ষামূলক। কাজটা করবে কেন্দ্রের তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ মন্ত্রক। খবর দিল অক্টোবর ২০১০-এর টেরা গ্রিন।

মধুময় ঝঞ্ঝাট

পাঞ্জাবের মধু চাষ বিপাকে। কারণ রফতানি সংকট। কারণ আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন অ্যান্টিবায়োটিক যুক্ত এই মধুকে অতিমাত্রায় সন্দেহজনক বলছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভারতের মধু আমদানিই পুরোপুরি নিষিদ্ধ করেছে। আমেরিকাও ভারতের ৫০টিন মধু আটকে রেখেছে ও আমদানি আইন ভাঙার অপরাধে ৮ কোটি মার্কিন ডলার জরিমানা করেছে।

খাব না চড়বো ?

জৈব জ্বালানি ব্যবহারেও রাশ টানতে হবে। গ্রিনহাউস গ্যাস কমাবে এই জ্বালানির ব্যবহার। কিন্তু এই জ্বালানির জন্য ভেরেন্ডার চাষ বাড়বে। ফলে টান পড়বে খাদ্যশস্যের জমিতে। এমনই বলেছেন মাননীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশ। বলেছেন সোসাইটি ফর ইন্ডিয়ান অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারার্স-এর এক সভায়। জলবায়ু বদলের বিপদে দেশে দেশে ডিজেলে ৫ শতাংশ জৈব জ্বালানি ব্যবহারের কথা হয়েছে। কিন্তু এই জ্বালানি উৎপাদনে সাবধানী হওয়া জীবনধারণের জন্য জরুরি। এইসব খবর এল জিন ক্যাম্পেন-এর সূত্রে।

পর্বতারোহণ

শিবালিক পাহাড় দেশের প্রথম 'আন্তঃরাজ্য সংরক্ষিত জীব-পরিমণ্ডল' রূপে গণ্য হতে চলেছে। পরিমণ্ডলে থাকছে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর ও উত্তরাখণ্ড প্রভৃতি রাজ্য। সংস্কৃতি ও ভূবিদ্যামাফিক শিবালিক পাহাড়ের ভূমিকা অতি গুরুত্বের। কিন্তু বেপরোয়া খনিজ তুলে সমগ্র অঞ্চল বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। জীব-পরিমণ্ডলের তকমা পেলে এইসব দিকে সুরাহা হবে আশা। টেরা গ্রিন অক্টোবর ২০১০ এসব জানাল।

তিমি-র

জাপানে তিমি খাওয়া বাড়ছে। তিমির মাংস গ্রহণে উৎসাহ দিতে জাপানে সরকারি স্কুলে কম দামে তিমির মাংস দুপুরের খাওয়ায় জুড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক ও জুনিয়র মিলে এই স্কুল সংখ্যা ২৯,৬০০। এমন সব খবর দিল অক্টোবর ২০১০-এর টেরা গ্রিন।

অ ভয়ারণ্য

২১০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর আর্দ্র-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনের উদ্ভিদ ও প্রাণী সংখ্যা বর্তমান সংখ্যার অর্ধেকে দাঁড়াবে। বিশ্বের মোট উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির অর্ধেকেরও বেশি আছে আর্দ্র-গ্রীষ্মমণ্ডলের অরণ্যে। কিন্তু কাঠসংগ্রহ, কৃষি ও বসতির জন্য অরণ্য-নিধনের ফলে এমন ঘটছে। জলবায়ু বদলের কারণে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার আর্দ্র-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্যের জীব বৈচিত্রের দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস পাবে। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, জলবায়ু বদল ও বর্তমান হারে অরণ্য ধ্বংস আমাজন অববাহিকার ৮০ শতাংশের বেশি জীব বৈচিত্রকে লোপাট করবে। আফ্রিকার অরণ্যে এই বৈচিত্র হ্রাসের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৭০ শতাংশ। এশিয়ার মধ্য ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এই ধরনের অরণ্যে জীব বৈচিত্র ৬০ থেকে ৭৭ শতাংশ লুপ্ত হবে। তবে এক্ষেত্রে কারণ জলবায়ু বদল নয়, কাঠ, কৃষি, বসতি ইত্যাদির জন্য বৃক্ষছেদন। অক্টোবর ২০১০-এর টেরা গ্রিনে এই সব খবর আছে।

কীআছে কপা লে !

উষ্ণায়নের ফলেই লে-র মেঘভাঙা বৃষ্টি। এমনই বলছে পুনার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিক্যাল মেটিওরলজির বিজ্ঞানীরা। তাদের বক্তব্য, উষ্ণায়নের দরুন বর্ষাকালে এইরকম দুর্যোগের ঘটনা বাড়ছে। উত্তর গোলার্ধের গড় তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু দেখা গেছে সেই তাপমাত্রা বেড়ে ১৫.৭ সেলসিয়াসে পৌঁছোবে। উষ্ণায়নের দরুন নিম্নচাপ এলাকা সরে যায় উত্তর-পশ্চিমে, যার দরুন মৌসুমী বায়ু লে-র অঞ্চলে পৌঁছে যায়। সাধারণত রাজস্থানের শুকনো এলাকার থেকেও লে-তে বৃষ্টিপাত কম। সংস্থার তরফে বলা হয়েছে উত্তরের শুকনো ঠান্ডা মেরুবায়ুর সঙ্গে দক্ষিণের উষ্ণ -আর্দ্র সামুদ্রিক গ্রীষ্মকালীন বায়ু মিশে এই মেঘ ভাঙা বৃষ্টি। খবর দিল আগস্ট ২০১০-এর গ্রিন ফাইল। ■■

সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু
সম্পাদনা সহযোগী : সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
হরফ : শিপ্রা দাস রূপ : অভিজিত দাস
মুদ্রাকর : লক্ষ্মীকান্ত নস্কর

Book Post
Printed Matter

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টারের পক্ষে সুব্রত ¯¯া কর্তৃক ১৮বি গড়িয়াহাট রোড (সাউথ) ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৩১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
যোগাযোগ : প্রজেক্ট অফিস, ৫৮এ ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৪২, দূরভাষ : ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬, ফ্যাক্স : ০৩৩ ২৪৪২ ৭৫৬৩
ই-মেল : drcsc@vsnl.com, www.drcsc.org
DL No. 92/3.11.95